Vol 9, Issue 3, 2026 **Impact Factor: 8.535** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2026.9.3.9131

IJAMSR

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারী : সেকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার আলোকে

Ajanta Chaudhuri

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi, India.

ভারতীয় সমাজে বেদের আমল থেকেই নারী ছিল সমাজের চরম অবহেলার পাত্রী। মনুসংহিতায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সমাজ জীবনে নারী স্বাধীনভাবে থাকার যোগ্য নয়। বিবাহের পূর্বে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যকে পুত্র তাদেরকে রক্ষা করে। আসলে পরাধীনতার নিদান যেন তাদের আজীবন সঙ্গি। পরাধীনতার বাঁধনে তারা যেন মনেপ্রাণে বাঁধা পড়ে আজীবন, স্বীকৃতি বলতেই শুধু পারিবারিক স্বীকৃতি। সুতরাং সমাজে নারীদের এই চোখেই দেখা হতো। ফলে ভালোভাবে বুঝতে পারা যায় এই সমাজে নারী প্রগতির কতদূর সম্ভব। এ সত্ত্বেও সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রী প্রমুখ নারীর অস্তিত্বের টিকে থাকার লড়াই দেখতে পাই। পাশাপাশি বিভিন্ন আখ্যান, উপাখ্যান, ব্রতকথা, উপকথায় মধ্যে নারীর জীবন সংগ্রামের ছবি ফুটে উঠেছে। এ তো গেল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারী প্রগতির কথা, এরপর ঊনবিংশ বিংশ শতকে নারী জাগরণ বা প্রগতির কথা আমরা জানতে পারি সেই সময়কার বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আন্দোলনের পর বিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে এসে নারীপ্রগতির সংগ্রাম নতুন পর্যায়ে এসেছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের যুগের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক প্রসারিত হয়েছে। সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয়েছে। হিন্দুদের বিধবাবিবাহ চালু ও বাল্যবিবাহ রদ হওয়ার পথে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়গুলি জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নারীর মধ্যে একাংশ শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের পথে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। নারীর শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারের সংগ্রামে বাংলার এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অগ্রণী মহিলারা সংগঠিত হতে শুরু করেছেন। নারীজাগরণের বা নারী প্রগতির এই সামাজিক ও রাজনৈতিক চিহ্নায়ণ রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যে বহু বিশেষণে বিশেষিত বাংলা ছোটগল্পের রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল বিষয় ছিল বাস্তব জীবন ও সমাজ সংসারের আলেখ্য। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মহৎ সাহিত্যিক হিসেবে প্রায় সব গুণই ছিল তাঁর। পল্লী গ্রামবাংলায় বেড়ে উঠা অতি সাধারণভাবে যে সব জনমানুষের চিত্র আঁকা হয়েছে, তাদের সবাইকে আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে পাঠক অবলীলায় মেনে নেয়। বাঙালির চিরায়ত নিদর্শনে ধ্যানমগ্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন আপাদমস্তক মানবতাবাদী সাহিত্যিক। তাঁর সৃষ্টিকর্মে তিনি মানুষের জীবনজগতকে ফুটে তুলেছিলেন বাস্তবতার নিরিখে। তাঁর চারপাশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সুখ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া, প্রকৃতি-পরিবেশ, জীবনাচরণকে নিজে

গভীরভাবে উপলব্ধি করে ঠাঁই দিয়েছিলেন নিজের সাহিত্যভাষায় বিশেষভাবে ছোটগল্পে। তার ভেতর বাঙালির শৈল্পিক সৌন্দর্যবোধ ও মননশীলতার উপাদানসমূহের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে। বাস্তবিক অর্থে তিনি জীবনের বহুবিধ রূপ বর্ণনার সার্থক শিল্পী, মানব মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর ছোটগল্পে সঠিক ধারার রূপায়ন ঘটিয়েছেন। সাধারণ বাস্তবতা ও ব্যক্তি মানুষের অন্তঃবেদনার এক মনোরম বহিঃপ্রকাশ তাঁর ছোটগল্পে। একজন সার্থক শিল্পীর মতো জীবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের অনুভূতির সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে শিল্পিত করেছেন। বিশেষ করে নারীর চাওয়া-পাওয়া ভালোলাগা, মন্দলাগা, তথা মনোবিশ্লেষণে তিনি একজন দক্ষ শিল্পী। তাঁর ছোটগল্পের নারী চরিত্রগুলো আমাদের সদাজাগ্রত চিরচেনা জগতের বাসিন্দা, আমাদের একান্ত কাছের আপনজন। বাঙালি নারী সমাজের নিপীড়নের নানা চিত্র শিল্পিত রূপে প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে নারী জীবন, বাস্তবতার স্পর্শে মহিমান্বিত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমসাময়িক সমাজের একজন অন্যতম আদর্শবাদী অগ্রণী চিন্তানায়কও ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যে পর্যায় শুরু হয় আমাদের দেশের ইতিহাসে, সেই যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয় চেতনার অন্যতম প্রতিনিধিও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই জাতীয় চেতনার বাণীরূপ দিতে পেরেছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্যের সেই যুগ 'রবীন্দ্রযুগ' নামে খ্যাত। এই যুগের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীপ্রগতির বিষয়টি কিভাবে প্রতফলিত হয়েছে, সেই নারীবীক্ষার কথা তুলে ধরব। তাঁর অসংখ্য গল্পে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতির ধারা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- ‘শাস্তি’, ‘দেনা পাওনা’, ‘বদনাম’, ‘অনুপ্রবেশ’, ‘সংস্কার’ প্রভৃতি। যেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী গৃহবন্দী থেকে শুধু অত্যাচারিত হয়নি, প্রতিবাদীও হয়ে উঠেছে সময়ে সময়ে, যা নারীর সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতাকে প্রমাণ করে।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীকে যে কত বঞ্চনা সহ্য করতে হয়েছে, তাঁর কবিতায় গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে তা প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, 'পলাতক' কাব্যগ্রন্থের ‘মুক্তি’ ‘ফাঁকি’, ‘নিষ্কৃতি’, ‘মায়ের সম্মান’, ‘কালোমেয়ে’ শীর্ষক কবিতাগুলি। এই সব কবিতার মধ্যেই নারীদের সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, পশ্চাদপদ ধ্যানধারণার বেড়াজাল ছিড়ে ব্যক্তিমানবের মোচনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। তেমনি সমাজ-পরিবারে প্রাত্যহিক জীবনে তথা নাটকীয় আকস্মিকতায় নারীর দুর্ভাগ্য-দুর্দশার কথা রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পে আছে। এইসব গল্পে মেয়েরা পণপ্রথা, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রভৃতি সামাজিক অপবিধানের দ্বারা বিশেষভাবে পীড়িত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নারীর এই দুর্বল রূপকেই শুধুমাত্র তাঁর রচনায় স্থান দিতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে আমরা এমন কিছু ছোটগল্পের সন্ধান পেয়েছি, যেগুলিতে তিনি নারীকে অন্য দৃষ্টি থেকে দেখছেন। পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় এখানে নারী ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। এই ঘুরে দাঁড়ানো হতে পারে নিরুচ্চার তবে দৃঢ়, হতে পারে হাস্যের অন্তরালে আবৃত নীরব আত্মদানে কিন্তু আত্মসমর্পণ নয়। হতে পারে বলিষ্ঠ

IJAMSR
International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের আস্বাদ, অথবা সরাসরি বিদ্রোহ। এরকমই নারী প্রগতির তাঁর প্রথম ছোটগল্প ‘দেনাপাওনা’ প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে ‘হিতবাদী’ পত্রিকায়। ‘দেনাপাওনা’ মূলত পণপ্রথা কেন্দ্রিক গল্প। বাঙালি সমাজে কুপ্রথা-পণ প্রথার ফলে এক বিবাহোত্তর জীবনের শোচনীয় পরিনিতি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যেখানে নিরুপমাকে শ্বশুরবাড়িতে পণের টাকা বাকি থাকার জন্য নির্মম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এত লাঞ্ছনা সহ্য করার পরেও তাঁর বাবা রামসুন্দর কে সে বলে-

> "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটি টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম; না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো টাকা চান না।"[১]

এখানেই রয়েছে নারী প্রগতির ভাবনা। গল্পটি উনিশ শতকের সমাজে দাঁড়িয়ে এই নারীর যে লড়াই সমাজের বিপরীতে গিয়ে, যা প্রগতিশীলতাকে নির্দেশ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শাস্তি’ গল্পে চন্দরার প্রবল অভিমান তাকে জীবনবিমুখ করে তুলেছে। 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা একটি গ্রাম্য চাষীর-বউ। তার স্বভাবে একটা স্বাধীনচিত্ততা ছিল। সংসারের প্রচলিত রীতিনীতিতে তার সেই স্বভাব-চাঞ্চল্যকে বাঁধা যেত না। ফলে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রেম ও অবিশ্বাসে মিশে গিয়েছিল। ঘটনাচক্রে বড়জাকে তার ভাসুর রাগের মাথায় খুন করে। সেই খুনের দায় তার স্বামী চাপিয়ে দিল বউয়ের উপর। বাঁধা জন্তুর মতো চন্দরা নিজের স্বামীর কাছ থেকে এই অমানুষিক আঘাতের প্রতিশোধ নিল। সে সেই মিথ্যাকেই দৃঢ়ভাবে তার স্বীকারোক্তিতে সমর্থন করে চলল-ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত একটুও টলল না। চন্দরা শেষ মুহূর্তে জজ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলেছে- ‘ওগো, তোমার পায়ে পড়ি ফাঁসি দাওনা, সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো আমার তো আর সহ্য হয় না।’[২] এই গল্পে চন্দরা শাস্তি না করেও 'শাস্তি' অর্থাৎ খুন না করেও খুন করার দায় চাপানোর জন্য সে আভিমানে জীবনবিমুখ হয়েছে। আপাতভাবে মনে হতে পারে চন্দরা এক প্রতিবাদহীন চরিত্র, এ যেন অভিমানে আত্মহনন। কিন্তু গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায় শুধু অভিমান মানুষকে এত দৃঢ় করে না। অভিমান, ঘৃণা, ক্রোধ মিশে তাকে একটা উন্মাদ প্রত্যয়ে পৌঁছে দিল। তারমনে গভীর বিশ্বাস ছিল মিথ্যাচারী স্বামীর মনের গভীরে বিবেকের দংশন কোথাও নিশ্চয় আছে। সেখানে তার এই দর্পিত আত্মত্মহনন আগুনের মতো জ্বলতে থাকবে। আসলে সে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে তার দীর্ঘ তর্জনী প্রসারিত করে নিরন্তর অভিযোগ জানিয়ে গেল। প্রতিবাদের সেই উত্তাপে দগ্ধ হতে থাকে পুরুষ শাষিত সমাজ ব্যবস্থা, পৌরুষত্বের প্রতি নারীর এই নীরব ধীক্কার মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে নারীর জাগরণ ঘটে এই গল্পে।

IJAMSR
International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

'মহামায়া' গল্প হিসেবে অতি উৎকৃষ্ট, আবার এক বিদ্রোহিনী নারীর চরিত্র চিত্ররূপেও তা ভাস্বর। গল্পটির ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ সময়ের হিসেবে বেশ খানিকটা অতীতে চলে গিয়েছেন। তখন সাহেবরা রেশম কুঠিতে ব্যবসা করতো এবং দেশে ভয়াবহ কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। সহমরণও চলতো সমাজে মাঝে মাঝে। নারীর উপর পীড়নের এই নিদারুণ বিষয় গল্পের অঙ্গ, পটভূমি মাত্র নয়। এইভাবে কাহিনিকে পিছনে ঠেলে নেওয়ার বিদ্রোহী নারীব্যক্তিত্ব একেবারে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছে। নায়িকা মহামায়া সামান্য সুযোগ পাওয়া মাত্র সহমরণের চিতার আগুন থেকে উঠে এসেছে। যেমন---

> "রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া, উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, মহামায়া তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?' মহামায়া কহিল, হ্যাঁ। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অভীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক আমি নাই আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বলো, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনো আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"[৩]

সে তার প্রণয়ীর সঙ্গে চলে গেছে-অবিবাহিত দম্পতি জীবন কাটিয়েছে। আবার যে মুহূর্তে তার দগ্ধমুখ প্রণয়ী দেখতে পেয়েছে তার মনে হয়েছে, এবার প্রেমিক রাজীবের প্রেমে করুণার স্পর্শ লাগবে, অমনি সে তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। এই গল্পটিতে মহামায়া তার প্রণয়ীর করুণার পাত্রী হয়ে বাঁচতে চায়নি। নারীর আত্মসম্মান রক্ষায় মহামায়া দুর্মর, স্বতন্ত্র। সেতার নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিয়েছে। তার এই একলা চলার পথের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, তার দূরদৃষ্টি ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ সহযোগে।

প্রথম মহাযুদ্ধের ইউরোপে পুরনো মূল্যবোধ ভাঙতে শুরু করেছে। সেখানেও আসন্ন হয়ে উঠেছে নারীর অধিকার নিয়ে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। রাজনৈতিক-সচেতন আন্দোলন, মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা, দেহের শুচিতা ও নৈতিকতা বিষয়ক ধ্যানধারণার ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখেছিলেন ‘স্ত্রীর পত্রের’ গল্প। নারীর সার্থকতা যে কেবল ঘরকন্না বা সন্তান ধারনে নয় একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন বলেই ‘স্ত্রীর পত্রে’র 'মৃণাল' চরিত্রটি সৃষ্টি করেন। যিনি বিবাহিত জীবনের পনেরো বছর পর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করেন যে জগৎ ও জগদীশ্বরের সাথে তার অন্য সম্বন্ধও আছে। যখন গল্পকার লেখেন- ‘তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র। আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।’[৪] তখন সেটি কেবল এক গৃহবধূর উপলব্ধি থাকে না তা তৎকালীন রমণীকুলের বক্তব্য হয়ে ওঠে।

I J A M S R
International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

'জীবিত ও মৃত' গল্প মূলত সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সমাজের ভেতর গড়ে ওঠা কুসংস্কার, রীতিনীতি, শাসন-শোষণ সবই নারীজাতিকে অবদমিত করার জন্য। যার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জয়ডঙ্কা বেজে ওঠে সর্বদা। গল্পটি পাঠের ফলে সামাজিক কুসংস্কারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা জীবন পরিচালনার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এছাড়া একজন অবহেলিত নারীর প্রতি সহনশীল হওয়ার দীক্ষাও গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব সমাজের মুক্তিকে নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। মানুষ তার হৃদয়কে প্রাধান্য দেবে। সামাজিক প্রথা-কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে নতুনভাবে সমাজকে বিনির্মাণের পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। তৎকালীন হিন্দু সমাজে কুসংস্কার যেন মজ্জাগত। রবীন্দ্রনাথ সমাজের সেই কুসংস্কারকে হয়তো সচেতনভাবেই এড়িয়ে যেতে চাননি। অথবা আধ্যাত্মিক পুরুষ হওয়ার কারণে মৃত ব্যক্তির আত্মার অতৃপ্তিকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এটাও হতে পারে তৎকালীন সমাজকে পরিপূর্ণরূপে রূপায়িত করা তার উদ্দেশ্য ছিল। তাই কাদম্বিনীর মৃত্যু রহস্যকে ঘিরে সামাজিক নীতি, আচার-আচরণ তুলে ধরেছেন। শারদাশংকরের একটি উক্তির মধ্যে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও এর প্রতি বিশ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন এভাবে-

> ছোট বউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল, 'কাকিমা' 'কাকিমা' করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিড়িয়া যাও, আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।'[৫]

কাদম্বিনী সমাজ-সংসার থেকে বিতাড়িত হয়ে শেষপর্যন্ত মৃত্যুর কোলেই মুক্তি খুঁজে নিয়েছে। প্রকৃতি ও মৃত্যু যেখানে তাকে আলিঙ্গন করে চিরন্তন মুক্তি দিয়েছে। যে সংসার-সন্তানকে ভালোবেসে আগলে রেখে সে তার আত্মিক শান্তির চেষ্টা করেছিল সেই সন্তানও পৃথিবীর রূঢ়তাকে ভুলে কাকিমার মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারিনি। বরং খোকা ভয়ে বাবাকে আলিঙ্গন করেছে। আর অবধারিতভাবেই যেন কাদম্বিনী সমাজের উপেক্ষার শিকার হয়েছে। শেষপর্যন্ত 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।' কাদম্বিনীর এ মৃত্যু সমাজের প্রথা, বিশ্বাস ও রীতিনীতির মৃত্যু। নীরব প্রতিবাদ অনেক সময় সরব হয়ে ওঠে। সমাজ যার বেঁচে থাকাকে কুসংস্কার, প্রথা ও নীতির আলোকে বিবেচনা করলো সেই সমাজকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছে কাদম্বিনী। যার ফলে সে নিয়তির কোলে সপে দিয়েছে নিজেকে।

একথা ঠিক রবীন্দ্রসাহিত্যে বহুপ্রকার নারী উচ্চমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবুও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানের মধ্যে যে আপস রবীন্দ্রসাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে নারীপ্রগতির ক্ষেত্র এই ধরণের একটা সমন্বয় সাধনের মধ্যদিয়ে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই শ্রমিজীবী, স্বাবলম্বী, সমাজ সচেতন সংগ্রামী নারীরা কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে তেমনভাবে স্থান পায়নি। আজ

IJAMSR

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

রবীন্দ্রযুগ বা নবজাগরণ বা স্বাধীনতার যুগ থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর আংশিক আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজে নারীপুরুষের সমান অধিকারের ভিত্তি অনেকাংশে স্থাপিত হয়েছে। নারীর সমান অধিকার, শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার আজ শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতিই পায়নি, বাস্তব সমাজের প্রয়োজন হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে আজকের দিনে প্রগতিশীল শিল্পে-সাহিত্যে, সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের সমান অধিকার, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের নারীর সক্রিয় ভূমিকা নানাভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, নারীর একান্ত নিজস্ব বয়ানই হয়ে উঠতে পারে নারীবীক্ষার প্রকৃত পথ ও প্রতিষ্ঠা। এই ভাবে নারীর সামাজিক অধিকারের ছবি গল্পকার যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা একথায় নারী প্রগতিশীলতাকেই প্রমাণ করে।

উনিশ শতকের নবজাগরণ ও নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি শুরু। মহিলারা প্রথম রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হন বিশ শতকের প্রথমভাগে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের ঐক্যবদ্ধতার দিবস রূপে পালন করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ 'রাখিবন্ধনের' ডাক দিলে, মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাছাড়া রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই ১৬ই অক্টোবর দিনটিকে 'অরন্ধন' দিবস রূপে পালন করার আহ্বান জানালে ঘরে ঘরে নারীরা সেদিন রান্না পর্ব থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই যখন বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে দেশী দ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয় তখনও মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই আহ্বানে সাড়া দেন। বিদেশি দ্রব্য বর্জনে ঘরে ঘরে নারীরা উদ্দীপিত ছিল। যেসকল মহিলারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সরলা দেবী চৌধুরানী, হেমাঙ্গিনী, নির্মলা সরকার, কুমুদিনী বসু প্রমুখরা। সরলা দেবী কর্তৃক 'লক্ষীর ভান্ডার' দেশি জিনিস বিক্রি করার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। আবার গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে নারীরা এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আবার বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই অনেক নারী পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দান করা, তাদের খাদ্য বস্ত্র জোগানো, গোপন সংবাদ নিয়ে যাওয়ার কাজ করা, অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকতেন। এইভাবে গণঅভ্যুত্থানেও নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এত গেল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক প্রগতির কথা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা ছোটগল্পে নারীর রাজনৈতিক অধিকার বা প্রগতির কথা জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্প 'বদনাম', যেখানে স্বদেশ সাধনার ক্ষেত্রে নারীর অন্তর বেদনা ও কঠিন কর্তব্যবোধের সমন্বয়ে ঘটেছে, সৌদামিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এই সৌদামিনী দেশ কর্মী অনিলের ক্ষুধার অন্ন জোগানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পুলিশ ইন্সপেক্টরের স্ত্রী হয়েও সে অনিলের দিদি। স্বদেশের কাজে নিজেকে

IJAMSR

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

নিয়োজিত করেছে স্বামী ইন্সপেক্টর তার চোখে ধুলো দিয়ে। স্বদেশী ডাকাত অনিলের সঙ্গে গোপনে যুক্ত হয়ে দেশ সেবায় দীক্ষা নিয়েছে। পুত্রহীনা এই নারী দেশ সেবায় ব্রত বহন করে দেশের মানুষের অগণিত দুঃখ দুর্দশা দূর করতে বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে। পুত্রহীনার রমণীর তাতেই তৃপ্তি। স্বামী অনিলের সন্ধান চাইলে সে দীপ্ত কণ্ঠে বলে মেয়েরা কুকুরের গলায় শিকলের মতো সাধবি খ্যাতি পড়ে থাকে। সংসারের তারা যে দুঃখের কারবার করতে এসেছে সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দিতে চায়, সে দেশের যত জমানো আস্তাকুরি। স্বামীর বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষার শেষে তেজস্বিনী সমস্ত শাস্তির বোঝা নিজেই মাথা পেতে নিয়েছে তা সত্বেও সে অনিলের কথা স্বামীকে বলেনি। রবীন্দ্রনাথের সৌদামনির চরিত্রে একাধারে দেশানুরাগিনি এবং স্বামীর সংসারের প্রতি কর্তব্য পরায়না নারীর চরিত্র পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অতি সামান্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সৌদামিনী রাজনৈতিক চেতনা সমগ্র নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এখানেই তাদের বিবর্তন। দেশের প্রতিকার অগণিত প্রেম কর্তব্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে সংসারের প্রতি সেবা অন্যদিকে দেশপ্রেমের কঠিন কর্তব্য সাধনের সমন্বয়ে রচনা করে ‘বদনাম’ গল্প এর সৌদামিনী সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

আবার ১৩৩২ বঙ্গাব্দের রবীন্দ্রনাথের উত্তর সবুজপত্র পর্যায়ের গল্প ‘সংস্কার’ গল্পটিতে পটভূমি হিসেবে উঠে এসেছে বঙ্গভঙ্গের উত্তপ্ত পরিবেশ। যেখানে পাই নারীর দেশ প্রেমের কথা। এই গল্পের নায়িকা কলিকার মতামত খুবই পরিস্ফুট। বড়বাজারে বিলিতি কাপড়ের বিরুদ্ধে পিকেট করতে গিয়ে তার নাম হয়েছিল ধ্রুবলতা। প্রকৃতিতে তিনি অত্যন্ত আঁট, স্বামী খদ্দর পরেন না বলে তার লজ্জা হয়। তার যুক্তি অকাট্য খদ্দর পড়ার শুচিতা যেদিন গঙ্গা স্নানের মতো লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়বে সেদিন দেশ বাঁচবে। বর্ণভেদ তার স্বামীর মুখের সামনে অগ্রাহ্য করেন। একদিন পথে এক মেথরকে অন্যায়ভাবে মার খেতে দেখলে সে প্রতিবাদ করে। এখানে বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদের দিকটাও জানা যায়। গল্পে কলিকা ও তার স্বামীর দুজনেরই রাজনৈতিক দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। কলিকা ও তার স্বামী দুজনেই পৃথক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। পৃথক তাদের আদর্শ কিন্তু দাম্পত্য জীবনে স্বামীর মতামত ও বিশ্বাসী গল্পে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্র গল্পে নারীর যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির কথা তুলেধরেছেন। সমগ্র গল্প জুড়ে দেশপ্রেমী নারী রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তার উদার ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যেকোনো পাঠককে দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে এক বিস্তৃত ও ধ্রুপদী উপলব্ধির জগতে নিয়ে যায়। দ্বিধাহীনভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রবীন্দ্রনাথ নিজেই আকাশের রবির মতো উজ্জ্বল। তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য পা রেখেছিল বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে। ছোটগল্পকে তিনি করে তুলেছিলেন গণমুখী। আমরা তাঁর ছোটগল্পে যে সামাজিক বাস্তবতার উপস্থাপন দেখতে পাই, সেটা রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যান্য ধারা থেকে আলাদা। সেদিন যেভাবে ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীর মুক্তি আন্দোলনের কথা, ক্ষমতায়নের কথা, স্বাধীনতার কথা, আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন,

Vol 9, Issue 3, 2026 **Impact Factor: 8.535** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2026.9.3.9131

IJAMSR

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

সে আদর্শ ধারা যদি আজ সমগ্র নারীসমাজ মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে, তাহলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে তারা নিজেদের অস্তিত্বের জয় ঘোষণা করবে-একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর তা না হলে, নারীর ক্ষমতায়নের ভালো ভালো কথাগুলি সাদা কালো অক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' ('দেনাপাওনা'), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - চৈত্র ১৩৫৭, পৃষ্ঠা-২৫।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' ('শাস্তি'), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - চৈত্র ১৩৫৭, পৃষ্ঠা-২৭২।

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' ('মহামায়া'), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - চৈত্র ১৩৫৭, পৃষ্ঠা-২১৭।

৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' ('স্ত্রীর পত্র'), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ– আষাঢ় ১৩৭৬, পৃষ্ঠা-৩০৫।

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' ('জীবিত ও মৃত'), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - চৈত্র ১৩৫৭, পৃষ্ঠা-১৫৩।